# প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ জেলা জলপাইগুড়ি। এই জেলাটি নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। জলপাইগুড়ি জেলার লোকসংস্কৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার স্বাভাবিকভাবেই গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাচীনকাল থেকেই এখানে নানা জাতি-জনজাতির বাস। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে বিশেষজ্ঞগণ এই জেলার জনগোষ্ঠীকে চারটি প্রধান নৃ-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন। যথা — অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় এবং আর্য। উক্ত চারটি নৃ-গোষ্ঠীর প্রাণপ্রবাহে লালিত এই জেলার লোকায়ত সংস্কৃতি। ফলে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও এই জেলা একটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। এই ভিন্নতাকেই লক্ষ্য করে উক্ত গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম।

জলপাইগুড়ি জেলাকে ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ অনেকেই বলে থাকেন। কথাটি সর্বাংশে সত্য । অতি প্রাচীনকাল থেকে এখানে নানা জাতি-জনজাতির মানুষ সহাবস্থান করে এসেছেন। এখানে অষ্ট্রিক জাতির সাঁওতাল, মুণ্ডা, খেড়িয়া/খাড়িয়া, মালপাহাড়িয়া ইত্যাদি নানা জনজাতির মানুষ রয়েছেন; পাশাপাশি রয়েছে ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গ্রুপের রাভা, গারো, টোটো, মেচ, কোচ ইত্যাদি জনজাতির মানুষ। এছাড়াও রয়েছে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু ভাটিয়ারা এবং সর্বোপরি এখানকার ভূমিপুত্র যারা জনসংখ্যার বিচারে বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ। তাই জনসংখ্যার বৈচিত্র্যের দিক থেকেও এই জেলাটি আমার কৌতূহল সৃষ্টি করেছে।

ইতিহাসের বিচারে এই জেলাটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। জেলার অতীত ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। একদিকে কোচবিহার রাজবংশের শাসনব্যবস্থা যেমন ছিল, তেমনি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চল প্রায় দীর্ঘকাল ভূটান রাজতন্ত্রের শাসনাধীন ছিল। অন্যদিকে তিস্তা নদীর পশ্চিমাংশ বৈকুণ্ঠপুরের রাজাদের করায়ত্ব ছিল। ফলে অতি প্রাচীনকাল থেকে জলপাইগুড়ি জেলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ত্রিমুখী অবস্থান লক্ষ করা যায়। রাজবংশী সমাজের লোকসংস্কৃতিতে এই অবস্থানকে আমরা নানাভাবে লক্ষ করি।

লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে সামাজিক রূপান্তর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। একে বলা যায় সামাজিক রূপান্তর। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষেত্রেও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংস্কৃতিরও নানা রূপ পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। যা আমার গবেষণা প্রকল্পকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।

জন্মসূত্রে উত্তরবঙ্গের তথা জলপাইগুড়ি জেলার ভূমিপুত্র হওয়ায় এবং গ্রামে মানুষ হওয়ার সুবাদে উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে আমার সান্নিধ্য আবাল্য। পরবর্তীকালে আমি নিজের চেষ্টায় লোকসংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান যেমন — ছড়া, ধাঁধা, গান ইত্যাদি সংগ্রহ করতে মনোযোগী হই। এম.

এ. পাশ করার পর লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করার আগ্রহ প্রবল হয়। সেই আগ্রহের ফলশ্রুতি হিসেবে বর্তমান গবেষণা প্রকল্পটি হাতে নিয়েছি।

এই গবেষণা প্রকল্পকে যথাযথ ভাবে রূপদান করতে গিয়ে আমি অনেক খ্যাত-অখ্যাত ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করেছি। যে সকল ক্ষেত্রবন্ধুগণ আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন তাদের নাম ও ঠিকানার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা 'তথ্যদাতা এবং ক্ষেত্রবন্ধুদের পরিচয় তালিকা' অংশে দিয়েছি। এছাড়াও যাঁরা আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে গবেষণা সম্পূর্ণ করতে নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়েছেন তারা হলেন - ড. অঙ্কুশ ভট্ট (অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), ড. সুবোধকুমার যশ (অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়) ,ড. মীর রেজাউল করিম (রীডার, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), ড. দীপককুমার রায় (লেকচারার, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), লোকসংস্কৃতিবিদ ড. গিরিজাশংকর রায় (প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বিবেকানন্দ কলেজ, আলিপুরদুয়ার) সর্বোপরি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. নিখিলচন্দ্র রায় (রীডার, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়) যাঁর সস্নেহ তত্ত্বাবধানে যথাসময়ে গবেষণাকর্ম সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে। এঁদের কাছে আমি চিরঋণী। এছাড়াও আমাকে গবেষণা কর্মে ছায়াসঙ্গীর মতো সাহায্য ও প্রেরণা যুগিয়েছে আমার সহধর্মিনী অপর্ণা। ভ্রাতৃ প্রতিম বুবুন অত্যন্ত পরিশ্রম করে যথা সময়ে টাইপ সম্পূর্ণ করেছে। এদের কাছেও আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

ক্ষেত্রসমীক্ষা ছাড়াও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার, আলিপুরদুয়ার এডোয়ার্ড লাইব্রেরী, কামাখ্যাগুড়ি টাউন লাইব্রেরী, কোলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগার ইত্যাদি থেকে আমি সহযোগিতা নিয়ে গবেষণা প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করেছি।

প্রহ্লাদ শর্মা

গাঠিয়া গজ, ফাটাপুকুর

জলপাইগুড়ি